জগদীশেরই শেষে জয় হয়েছিল...

রোজ অ্যাডেনিয়াম

১৯০১ সালের ১০ মে। লন্ডনের রাজকীয় বিজ্ঞান সমিতির কেন্দ্রীয় মিলনায়তনে বসেছে এক আসর। সেখানে এক বিজ্ঞানী বক্তব্য দেবেন। তবে দর্শকদের মধ্যে তাকে নিয়ে কোনো মাথাব্যথা নেই। ভাবগতিক দেখে মনে হচ্ছে অনেকটা বাধ্য হয়ে বসে আছেন তারা। নাক সিঁটকাচ্ছেন। বিজ্ঞানী এসেছেন ভারতবর্ষ থেকে। ওখানকার লোকজনের আবার বিজ্ঞানচর্চা! এই যখন ভাবছিলেন তখন ওই বিজ্ঞানীর আগমন। হাতে একটি গাছের মূল আর একটি বোতলে পানি। গাছটিকে নানারকম তার দিয়ে একটি অদ্ভুত যন্ত্রের সঙ্গে লাগানো হয়েছে। যা দেখে কারও মাঝেই উচ্ছ্বাস তো দূরের কথা আগ্রহও দেখা গেল না। উপস্থিত সকলকে ওই বিজ্ঞানী জানালেন, বোতলের ভেতর যে তরল আছে সেটি ব্রোমাইড সলিউশন। এতে সবাই মনে মনে ভাবতে লাগলেন লোকটা গাছটিকে অযথা মেরে ফেলতে নিয়ে এসেছেন। এরপর শুরু হলো ভারতীয় বিজ্ঞানীর কার্যক্রম। গাছের মূলটি সলিউশনে দিলেন। চালু করলেন যন্ত্র। সঙ্গে সঙ্গে নড়ে উঠল গাছ। এরকম দৃশ্য আগ্রহী করে তুলল উপস্থিতদের। ততক্ষণে হয়ে গেছে আসল কাজ। মুহূর্তেই গ্রাফটি দ্রুত উঠানামা শুরু করল। এবং এক সময় থেমে গেল। গাছটিও মরে গেল। গাছের জীবন সমাপ্ত হতেই কোলাহল শুরু হলো বিজ্ঞান সমিতির মিলনায়তন কেন্দ্রে। কেননা উদ্ভিদের জীবন আছে এতদিন সবাই বিশ্বাস করলেও তা এভাবে প্রমাণ দেখাতে পারেনি কেউ। উদ্দীপনে গাছও যে প্রতিক্রিয়া দেখায় সেটিই সেদিন দেখিয়েছিলেন ভারতীয় বিজ্ঞানী। বিষয়টি যারপরনাই আন্দোলিত করে উপস্থিতদের। ডাকসাইটে সব বিজ্ঞানী উপস্থিত ছিলেন সে আয়োজনে। তারা অভিবাদন জানাতে থাকেন জগদীশ চন্দ্র বসু ও তার স্ত্রীকে। বাংলাদেশের বিজ্ঞানী স্যার জগদীশ চন্দ্র বসুর কথাই বলছিলাম। এভাবেই সাত সমুদ্র তেরো নদীর এপার থেকে পশ্চিমাদের মাঝে তুলেছিলেন আলোড়ন।

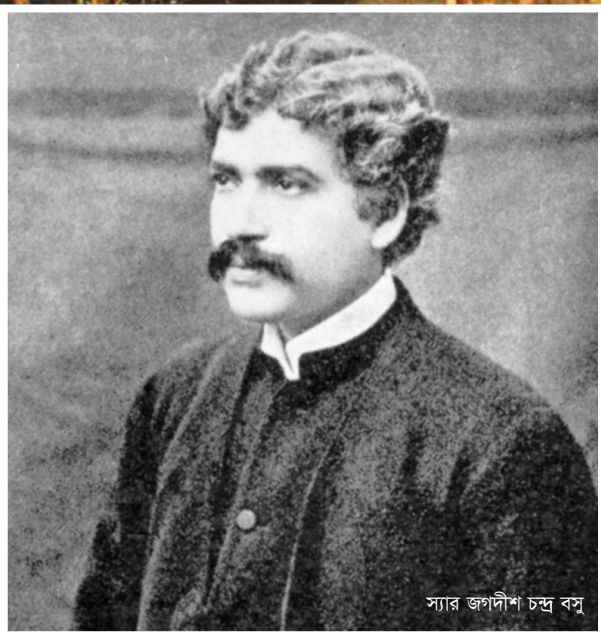
স্যার জগদীশ চন্দ্র বসু

জন্ম ও বেড়ে ওঠা

১৮৫৮ সালের ৩০ নভেম্বর নানা বাড়ি ময়মনসিংহে জন্মগ্রহণ করেন জগদীশচন্দ্র বসু। তার পৈতৃক নিবাস মুন্সিগঞ্জের রাঢ়িখালে। জগদীশ চন্দ্র বসুর বাবা ভগবান চন্দ্র বসু ছিলেন একজন ম্যাজিস্ট্রেট। মা বনসুন্দরী বসু। আর্থিক সচ্ছলতার মধ্যে থেকেই বড় হয়েছেন জগদীশ। সে সময় অভিজাত শ্রেণি সন্তানদের ইংলিশ মিডিয়ামে পড়াত। কিন্তু সেটি না করে জগদীশ চন্দ্রের বাবা করলেন উল্টো। সন্তানকে পড়ালেখা করতে পাঠালেন গ্রামে। সেখানে নিজেদের স্কুলে ভর্তি করে দিলেন ভবিষ্যতের বিজ্ঞানী জগদীশকে। ওই স্কুল থেকেই প্রাথমিকের গণ্ডি পার হন স্যার জগদীশ। এরপর হাই স্কুলে ভর্তি হন ফরিদপুরে। ১৮৬৯ সালে ফরিদপুরের পাঠ চুকিয়ে জগদীশ চন্দ্র পা রাখেন কলকাতায়। সেখানে প্রথমে সেন্ট জেভিয়ার স্কুল পরে কলেজ শেষ করেন। কলকাতা এসে জগদীশ পরিচিত হন ফাদার ইউজিন লেকোর সঙ্গে। তিনি ছিলেন বিজ্ঞানপ্রেমী মানুষ। ভারতবাসীকেও বিজ্ঞানমুখী করার প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছিলেন। তার এই কর্মকাণ্ড ভালো লাগে তরুণ জগদীশের। ভক্ত বলে যান তিনি। জগদীশকে বিজ্ঞানী হয়ে উঠতে ফাদার ইউজিন ল্যাকোর প্রভাব বেশ কার্যকর ছিল।

বিলেত গমন

তখনকার দিনে উচ্চশিক্ষার জন্য বিলেত তথা লন্ডন যেত মানুষ। বিজ্ঞানী জগদীশ চন্দ্রেরও এরকম ইচ্ছা ছিল। তবে সায় ছিল না বাবা-মায়ের। এর পেছনে রয়েছে দুটি কারণ। এর কদিন আগে জগদীশচন্দ্রের ১০ বছরের ছোট ভাই মারা যায়। ফলে একমাত্র পুত্রকে সাত সমুদ্র তেরো নদীর পাড়ে পাঠাতে মন টানেনি ভগবান ও বনসুন্দরীর। অন্যদিকে ভগবানের অর্থনৈতিক স্বচ্ছলতা ও আগের মতো ছিল না। অসুস্থতার কারণে ঘরে বসে থাকতে হতো। মাইনের অর্ধেকটায় কোনোমতে চলত সংসার। এ অবস্থায় বিলেত যাওয়া জগদীশের কাছে ছিল অনেকটা গরিবের ঘোড়া রোগের মতো। ফলে ইচ্ছা সত্ত্বেও সিদ্ধান্ত পাল্টান তিনি। বিষয়টি ধরতে পেরেছিলেন তার মা। ছেলের ইচ্ছা পূরণ করতে নিজেদের অনিচ্ছা ও অক্ষমতাকে পাশ কাটিয়ে গহনা বিক্রি করে অর্থ তুলে দেন জগদীশের হাতে। সে অর্থ নিয়েই বিলেতের উদ্দেশে জাহাজে চেপে বসেছিলেন জগদীশ। চিকিৎসাবিদ্যায় পড়তে বিলেত গিয়েছিলেন জগদীশ। কিন্তু ডাক্তারি পড়াটা কপালে ছিল না তার। শারীরিক অসুস্থতার কারণে ভীষণ দুর্বল হয়ে পড়েন তিনি। অন্যদিকে ডাক্তারি পড়াটা ছিল বেশ পরিশ্রমের কাজ। তাই ওপথে আর হাঁটেননি জগদীশ। এ সময় পাশে দাঁড়ান তার স্ত্রীর ভাই আনন্দমোহন। তার সহায়তায় কেমব্রিজে ভর্তি হন জগদীশ চন্দ্র বসু। এরপর লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বিএসসি সম্পন্ন করেন। ভিনদেশ জগদীশ চন্দ্র বসুকে বিজ্ঞানের আরও কাছে নিয়ে আসে। এ সময় তিনি শিক্ষক হিসেবে পেয়েছিলেন লর্ড রেইলি, মাইকেল ফস্টার, সিডনি ভাইন, ফ্রান্সিস ডারউইনের মতো বিজ্ঞানীদের। বিলেতের পাঠ চুকিয়ে ১৮৮৫ সালে ভারত ফেরেন জগদীশ।

বিলেতের ডিগ্রি তবুও অবহেলা

দেশে ফিরে কলকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজে যোগ দেন পদার্থবিজ্ঞানের অধ্যাপক হিসেবে। বিলেত থেকে ডিগ্রি নিয়ে এসেও অবহেলা শিকার হতে হয়েছিল অধ্যক্ষ চার্লস টাউনি এবং বাংলার পাবলিক ইনস্টিটিউটের পরিচালক স্যার আলফ্রেডের কাছে। ভারতীয়রা পড়াতে পারে না এই অজুহাতে জগদীশকে চাকরিতে যোগদানের তীব্র বিরোধিতা করেন আলফ্রেড। জগদীশও চুপ করে ছিলেন না। ভারতের ভাইসরয় লর্ড রিপনের দারস্ত হন। অবশেষে ভাইসরয়ের হস্তক্ষেপে নিয়োগ পান। বসেছিলেন না স্যার আল ফ্রেডও। ভাইসরয় নিয়োগ দিলেও এই দুজন অস্থায়ী শিক্ষক হিসেবেই রেখে দেন জগদীশকে। বেতনও ধরেন অর্ধেক। জগদীশ ছিলেন মেরুদণ্ডওয়ালা মানুষ। একটানা তিন বছর অধ্যাপনা করেন কোনো বেতন না নিয়ে। এভাবেই মুখের ওপর জবাব দেন টাওনি ও আল ফ্রেডের। পেতেন না গবেষণারও সুযোগ।

জয় জগদীশের

এ যুদ্ধে জয় হয় জগদীশের। তিন বছর তার মেধা ও পাণ্ডিত্যে মুগ্ধ হয় কলেজের সবাই। তরুণ অধ্যাপককে নিয়ে আর আপত্তি থাকে না কারও। কলেজ কর্তৃপক্ষ তাকে পূর্ণ বেতনে অধ্যাপক হিসেবে নিয়োগ দেয়। তিন বছরের বেতনও দেওয়া হয়। শেষ বয়সে এসে জগদীশচন্দ্র বসুর বাবা ধার দেনায় জর্জরিত হয়েছিলেন। কলেজ থেকে পাওয়া টাকায় সেই দেনা শোধ করেন জগদীশ। এদিকে প্রেসিডেন্সি কলেজে গবেষণার জন্য প্রয়োজনীয় গবেষণাগার ছিল না। তাই বাড়িতেই একটি গবেষণাগার নির্মাণ করেন জগদীশ। প্রতিদিন চার ঘণ্টা শিক্ষকতার পর সেখানেই ব্যয় করতেন সময়। এদিকে অধ্যাপনার প্রথম আঠারো মাসে তিনি যে গবেষণা করেছিলেন তা লন্ডনের রয়েল সোসাইটির জার্নালে প্রকাশিত হয়। এর উপর ভিত্তি করেই বসুকে লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডিএইচসি ডিগ্রি প্রদান করা হয়। জগদীশচন্দ্র বসুর এই গবেষণাগুলোর ওপর ভিত্তি করে তাকে ইংল্যান্ডের লিভারপুলে বক্তৃতা দিতে আমন্ত্রণ জানায় ব্রিটিশ অ্যাসোসিয়েশন। এখানে বক্তৃতা দেওয়ার পর আরও কয়েক জায়গা থেকে আমন্ত্রণ পান জগদীশচন্দ্র বসু। এরমধ্যে রয়েছে রয়েল ইনস্টিটিউশন, ফ্রান্স এবং জার্মানি। সেসব জায়গায় সফল বক্তৃতা শেষে দেশে ফেরেন ১৮৯৮ সালে।

বিজ্ঞান চর্চা

উদ্ভিদের প্রাণ আছে আবিষ্কার করলেও জগদীশচন্দ্র বসু শুরুর দিকে কাজ করছিলেন তরঙ্গ নিয়ে। ১৮৯৪ সালে কলকাতায় বিনা তারে বার্তা প্রেরণ করেন বসু এবং তা গ্রহণ করার কৌশল দেখিয়ে দেন। যা দেখে তাক লেগে যায় সবাই। বড়লাটও বেশ সন্তুষ্ট হন। তার এই আবিষ্কার ইংল্যান্ডবাসীকে দেখানোর জন্য সেখানে পাঠাতে কলেজ কর্তৃপক্ষকে সহায়তা করেন। তারই ধারাবাহিকতায় ১৮৯৬ সালে জগদীশচন্দ্র বসু তার সব আবিষ্কার নিয়ে হাজির হন লন্ডনে রাজকীয় বিজ্ঞান সমিতিতে। সেখানে বার্তা প্রেরণের বিষয়টি পুনরাবৃত্তি করেন। তবে লন্ডন থেকে দেশে ফেরার পর তরঙ্গ নিয়ে কাজে আগ্রহ হারিয়ে ফেলেন বসু। তার মন চলে যায় প্রাণের আবিষ্কার। ভাবতে থাকেন ধাতব বস্তুতে প্রাণ আছে কি না। পরে এই পদার্থবিজ্ঞানের অধ্যাপকের আগ্রহের কেন্দ্রবিন্দুতে উঠে আসে উদ্ভিদ। উদ্ভিদের প্রাণ নিয়ে গবেষণা শুরু করেন বসু। এবং সফল হন। তবে বিনা তারে বার্তা প্রেরণের স্বীকৃতিও জগদীশকেই দিয়েছেন বিজ্ঞানীরা। তিনি কাজ করেছেন মাইক্রোতরঙ্গ নিয়ে। অন্যদিকে রেডিওর আবিষ্কারক মার্কিনী কাজ করেছেন বেতার তরঙ্গ নিয়ে।

অর্জন

এক জীবনে যত অবহেলা পেয়েছেন জগদীশ তার পুরোটাই ভুলেছেন বিজ্ঞান দিয়ে। যে জগদীশকে তার কলেজ অধ্যাপক হিসেবে স্বীকার করেনি সেই জগদীশকেই অবসরের পরও ছাড়তে রাজি হয়নি। আরও দুই বছর সিনিয়র প্রফেসর হিসেবে রেখে দিয়েছে। ব্রিটিশ সরকারের কাছ থেকেও সম্মাননা পেয়েছেন এই বিজ্ঞানী। অবসরের পর তাকে প্রফেসর অব ইমেরিটাস এর সম্মান দেওয়া হয়। এছাড়া কমান্ডার অব ইন্ডিয়ান এমপায়ার উপাধি পান ১৯০৩ সালে। একটা সময় কলেজে গবেষণাগারের অভাবে গবেষণা করতে কষ্ট হতো। বাড়িতে যৎসামান্য টাকা দিয়ে কোনরকমে গবেষণাগার তৈরি করেছিলেন। ১৯২৭ সালে কলকাতায় একটি বিজ্ঞান গবেষণা কেন্দ্র নির্মাণ করে সে আক্ষেপ মেটান। যেটিকে বসু বিজ্ঞান মন্দির বলেই ডাকে সবাই। পরের বছরই রাজকীয় বিজ্ঞান সমিতির ফেলো নির্বাচিত হন এই বিজ্ঞানী। তিনি ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ সাইন্সেস অফ ইন্ডিয়ার প্রতিষ্ঠাতা ফেলো। এর বর্তমান নাম ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল সাইন্স একাডেমি।বিবিসি জরিপে তিনি হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালির তালিকায় সপ্তম স্থান লাভ করেন।

দেশপ্রেম

জগদীশ চন্দ্র বসু শুধু বিজ্ঞান নিয়েই ব্যস্ত থাকলেও দেশপ্রেমের বেলায় অনড়। পরাধীন ভারতবর্ষে জন্ম নিয়েছিলেন বলেই হয়তো এতটা প্রখর ছিল দেশাত্মবোধ। তিনি তার বিভিন্ন বক্তৃতায় বিজ্ঞানের পাশাপাশি দেশাত্মবোধ তুলে ধরতেন।

আইনস্টাইনের ভালোবাসা

বিজ্ঞানী হিসেবে শুধু ভারতবর্ষেই খ্যাতি সীমাবদ্ধ ছিল না জগদীশের। ছড়িয়েছিল পশ্চিমা দেশেও। আইনস্টাইনও কদর করতেন তার। আইনস্টাইন তার সম্পর্কে লিখেছিলেন, জগদীশ যেসব অমূল্য তত্ত্ব পৃথিবীকে উপহার দিয়েছেন তার যেকোনোটির জন্য পৃথিবীতে বিজয় স্তম্ভ স্থাপন করা উচিত। ১৯২৭ সালে লন্ডনের ডেইলি এক্সপ্রেস পত্রিকা বসুকে নিউটন ও গ্যালিলিওর সমকক্ষ হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছিল।

মৃত্যু

১৯৩৭ সালের ২৩ নভেম্বর ছিল জগদীশচন্দ্র বসুর জীবনের শেষ দিন। এদিন ঝাড়খণ্ডের গিরিটিতে দেহত্যাগ করেন তিনি। মৃত্যুর আগ পর্যন্তও করে গেছেন বিজ্ঞানের সেবা। তার জীবনের সঞ্চিত অর্থ ১৭ লক্ষ টাকার মধ্যে ১৩ লক্ষই দান করে দেন বসু বিজ্ঞান মন্দিরে।